উপাচার্য নিয়োগে টেকসই সমাধান কী

ড. মোহাম্মদ আলী

প্রকাশ: ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১২:০০
এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

6
Shares

আরও পড়ুন

বন্যায় ২৭৯৯ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত

ভারতীয় আগ্রাসন ও সীমান্ত হত্যার প্রতিবাদে জবিতে বিক্ষোভ

৮ লাখ টাক বাকি খেয়ে উধাও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা

এনসিটিবির বিতর্কিত

আরও ৭ কর্মকর্তাকে অপসারণ

রাজধানীতে সড়ক অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের ফলে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। সরকার পতনের পর পর্যায়ক্রমে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা শুরু করেন।

অতীতে এমনও ঘটেছে যে, সরকার পরিবর্তনের পরপরই রাতের অন্ধকারে উপাচার্য তার বাসভবন ছেড়ে গিয়েছিলেন। বিষয়টি ওই একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য তো বটেই, দেশের সব শিক্ষকসমাজের জন্য কতটা অসম্মানজনক ছিল, তা ভাবাও যায় না। সরকার আসবে বা

সরকার যাবে, এটাই একটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্য স্বাভাবিক। উপাচার্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অভিভাবক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশটা কতটা খারাপ হলে এরূপ ঘটনা ঘটে, তা সহজেই অনুমেয়। কেন একজন উপাচার্যকে এমন করতে হবে?

এখন পর্যন্ত দেশের ৫৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় অভিভাবকশূন্য।

উপাচার্যরা তাদের পদত্যাগের মূল কারণ দেখিয়েছেন ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক সমস্যা। কিন্তু মূল বিষয়টি ছিল উপাচার্যরা এটা হয়তো বুঝেছিলেন যে, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তাদের উপাচার্য পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না অথবা ধারণা করেছিলেন অতীতের মতো সরকার পরিবর্তনের পর নতুন অন্তর্বর্তী সরকার তাদের সরিয়ে দেবেন, যা তাদের জন্য

সম্মানজনক হবে না অথবা তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না।

নিতান্তই সম্মানের ভয়ে যারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে পদত্যাগ করেছেন, তারা হয়তো শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈষম্য করেননি। কিন্তু যারা পদত্যাগ না করে উপাচার্য পদটি ধরে রাখার শেষ চেষ্টা করছেন, তাদের হয়তো বিশেষ কোনো কারণ আছে।

অনেক উপাচার্য ক্ষমতায় থাকাকালে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করেছেন, যারা বৈষম্য করেছেন, তারা এ সময়ের মধ্যে দ্রুততার সঙ্গে সবার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন, কারণ তারা জানেন সমস্যাগুলোর সমাধান না করে পদত্যাগ করলে তারা অনেক অসম্মানিত হবেন। এক্ষেত্রে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রেখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পক্ষের দাবি থাকা

সত্ত্বেও তিনি পদত্যাগ করেছেন, তিনি বলেছেন মাই রেসপেক্ট কামস ফার্স্ট।

শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা কান্না পর্যন্ত করেছেন। এ রকম উপাচার্যই প্রয়োজন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। রাজনৈতিক মনোনয়নে উপাচার্য পদ পেয়ে নীতি-নৈতিকতা দেখানো অনেক কঠিন, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পক্ষের আস্থা থাকলেও বাইরের স্থানীয় এলাকার জনগণকে আস্থায় নেওয়া কঠিন, তাদের অযৌক্তিক দাবি মেনে নিতে হবে, এভাবে তারা কাজ করতে পারবেন না আর সে কারণেই তারা পদত্যাগ করেছেন। আর উপাচার্যদের গণহারে পদত্যাগ করার নৈতিকতার কারণের পাশাপাশি একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকতে পারে, তা ভবিষ্যতে বিশ্লেষণ হতে পারে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম গণহারে পদত্যাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের।

পৃথিবীর কোনো দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের গণহারে পদত্যাগের ঘটনা নজিরবিহীন। অন্যান্য দেশেও সরকারের পরিবর্তন হয়, এক দলের পরিবর্তে অন্য দল রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসে, জনপ্রশাসনে সামান্য পরিবর্তন এলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উপাচার্য ও অন্যান্য পদে পরিবর্তন হয় না, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে সব ধরনের রাজনীতির বাইরে রাখা হয়।

যারা ভবিষ্যতে উপাচার্য হতে চাইবেন, তাদের বিষয়টি ভাবতে হবে আমাদের শিক্ষার্থীরা ও দেশের মানুষ এটা আর দেখতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দক্ষ পেশাজীবী তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে, কর্মসংস্থানভিত্তিক বিষয়গুলো চালু করে বিশ্বমানের গ্রাজুয়েট তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় এ চাহিদা কতটুকু পূরণ করতে পারছে, তা প্রশ্নের মুখোমুখি। প্রকৌশল, কৃষি, মেডিকেল ও অন্যান্য বিশেষায়িত

বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে আছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যা শতভাগ কর্মসংস্থানভিত্তিক গ্রাজুয়েট তৈরিতে অবদান রেখে চলেছে, যা আমাদের দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপাচার্য পদের জন্য অধ্যাপকরা কেন এত প্রতিযোগিতা করেন ও দলীয় রাজনীতির অংশ হন? কারণ ক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদা ও অতিরিক্ত সুবিধা, যেমন একজন উপাচার্য বিলাসবহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ি, অফিসের জন্য পাজেরো গাড়ি, পরিবারের জন্য সার্বক্ষণিক গাড়ি, আপ্যায়ন ভাতা, ধোলাই ভাতা, গৃহকর্মীর বেতন, সব নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি, সব ক্রয়কার্যে হেড অব প্রকিউরমেন্ট এনটিটি, শিক্ষার্থীদের প্রতিটি সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের জন্য সম্মানি, সভার সম্মানি, ভর্তি পরীক্ষার সভাপতি হিসাবে মোটা অঙ্কের সম্মানি, বড় বড় আর্থিক প্রকল্পের একচ্ছত্র

নিয়ন্ত্রণকারীসহ বাড়তি অনেক আর্থিক সুবিধা পান। আর এজন্যই উপাচার্য পদের জন্য ২ কোটি টাকার ঘুস প্রদান করার অনিয়ম উঠে আসে পত্র-প্রতিকায়। এত সুবিধা ও ক্ষমতা একজন উপাচার্যকে শুধু দাম্ভিকই করে না, সঙ্গে সঙ্গে স্বৈরাচারীই করে। উপাচার্যরা তাদের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের নিজেদের শক্তি মনে না করে তারা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সহযোগিতার ওপর ভর করে ভুলে যেতে থাকেন যে, তিনি একজন শিক্ষক আর হয়ে ওঠেন একজন প্রশাসক।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের প্রধান কাজ হলো উন্নয়ন, মূল্যায়ন, তত্ত্বাবধান এবং একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজের সঠিক ব্যবস্থাপনা। উন্নয়ন বলতে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, গবেষণার জন্য সহায়ক সব ব্যবস্থার উন্নয়ন, উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কারিকুলাম তৈরি ও ক্রমাগতভাবে এর উন্নয়ন করা, টিচিং-লার্নিং

পদ্ধতির উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন।

শিক্ষার্থীদের দক্ষভাবে গড়ে তুলতে হলে যে আদর্শ গ্রাজুয়েট প্রোফাইল (বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, লাইফ লং লার্নিং, সৃজনশীলতা, টিম ওয়ার্ক, লিডারশিপ, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইথিকস, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফিন্যান্স, সাসটেইনেবিলেটি, মডার্ন টুলস, পরিবেশ ও সমাজ) থাকে, তা অর্জনে শিক্ষার্থীদের অবারিত সুযোগ করে দিতে হবে এবং সে পথকে সুগম করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কেমন হবে, বিশেষজ্ঞরা ইতোমধ্যে পত্র-পত্রিকায় তাদের লেখাতে উপস্থাপন করেছেন। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পাশাপাশি রাজনীতির হস্তক্ষেপ না করার জন্য মতামত আছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় এটা সম্ভব হলেও রাজনৈতিক দলগুলো যখন সরকার

গঠন করবে, অবশ্যই তাদের মতাদর্শের অধ্যাপক শিক্ষককে উপাচার্য হিসাবে মনোনীত করবেন। ভবিষ্যতে রাজনৈতির দলগুলো সরকার গঠন করলেও যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগে সরকার প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে।

অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি প্যানেল তৈরি করা হয় আর ওই প্যানেল থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বা আচার্য একজনকে উপাচার্য নিয়োগের জন্য আদেশ দেন। এখানেও রাজনৈতিক প্রভাব থাকে। এ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে ডিন ও বিভাগীয় প্রধানদের নিয়োগের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যা অনেকটা গণতান্ত্রিক। সেই আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের মধ্যে কোনো আইনি জটিলতা বা আইনের মারপ্যাঁচ না রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রশাসনিক পদ, যেমন ডিন ও বিভাগীয় প্রধান নিয়োগের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভাগ বা অনুষদের শিক্ষকরা পালাক্রমে নিয়োগ পেয়ে থাকেন।

একইভাবে দলমত নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যাপকরা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে ২ বছর মেয়াদে উপাচার্য পদের দায়িত্ব পেতে পারেন-যা হতে পারে সুশাসনের জন্য এক ধরনের সমাধান। আর সেটা হলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, দলীয় রাজনীতির ধারক ও রাজনীতিবিদদেরসহ অন্য কারও কাছে তদবির করে উপাচার্য হতে হবে না। এটা করতে পারলে সবার কাঙ্ক্ষিত মানের বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চিত করা সম্ভব।

ড. মোহাম্মদ আলী : অধ্যাপক, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

উপাচার্য | নিয়োগ | টেকসই সমাধান